ডলার আছে নেই

আসজাদুল কিবরিয়া

গত আড়াই-তিন মাস ধরে রাজধানীর বাণিজ্যিক পাড়া মতিঝিল-দিলকুশায় ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীদের মুখে ঘুরে-ফিরে একটি কথা খুব বেশি শোনা যাচ্ছে। তা হলো, 'ডলার নেই, এলসি খুলতে পারছি না, আগের এলসির দেনাও শোধ করতে পারছি না।' এরা প্রায় সবাই একই সুরে অভিযোগ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংক ঠিকমতো ডলার দিচ্ছে না। অর্থবছরের একেবারে শেষভাগে মানে জুন মাসের শেষ দু'সপ্তাহে এসে পরিস্থিতি যেন আরো সংকটময় হয়ে উঠেছে। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসেবে ৩০০ কোটি ডলার জমা রয়েছে। এরকম অবস্থায় বাজারে ডলারের দামও বেড়ে চলেছে। গত ৪ জুলাই গড়ে বাজারে ডলার বিক্রি হয়েছে ৬৫.৭০ টাকা দরে। এটা কী তাহলে এমন পরিস্থিতি যাকে 'ডলার সংকট' হিসেবে অভিহিত করা যায়? ঢালাওভাবে অনেকে তাই বললেও এটা বলার আগে দু'তিনটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ডলারের কারণে এলসি বা আমদানি ঋণপত্র খুলতে পারছে না বলে ব্যাংক ও ব্যবসায়ীদের যে অভিযোগ তা আগে খতিয়ে দেখা যাক। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব অনুসারে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে আমদানির জন্য যে পরিমাণ ঋণপত্র খোলা হয়েছে তার মূল্যমান এক হাজার কোটি ডলারের বেশি যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২৪% বেশি। আর এই সময়ে আমদানি বাবদ প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮৬৮ কোটি ডলার যেখানে রপ্তানি বাবদ আয় হয়েছে ৬০৫ কোটি ডলার। ফলে নয় মাসে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২৬৩ কোটি ডলার যেখানে বিগত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট ঘাটতি ছিল ২৩৬.৯ কোটি ডলার। রপ্তানির তুলনায় আমদানি বৃদ্ধির হার বিগত বছরগুলোর চেয়ে এবার তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার কিছু পদক্ষেপ নেয়। কারণ, আমদানি ঋণপত্র যেভাবে বাড়ছিল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে ডলারেরও দাম বাড়তে থাকে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঢালাওভাবে ঋণপত্র না খুলে নিজস্ব তহবিল সামর্থ্য অনুসারে ঋণপত্র খোলার পরামর্শ দেয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ নিজস্ব রিজার্ভ থেকে বাজারে ডলার ছাড়ার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এর ফলে বাজারে একদিকে ডলারের সাময়িক ঘাটতি দেখা দেয়, অন্যদিকে ব্যাংকগুলো নতুন ঋণপত্র খোলা কমিয়ে দেয় যার প্রতিফলন ঘটেছে এপ্রিল ও মে মাসের আমদানি ঋণপত্র খোলার পরিসংখ্যানে। জুলাই-এপ্রিল সময়কালে এলসি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৫% আর জুলাই-মে সময়কালে ২০%।

তবে সংকট দেখা দেয় আগে খোলা এলসিগুলোর দেনা পরিশোধে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ডলারের প্রধান সরবরাহকারী সোনালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক। এর বাইরে উত্তরা, পূবালী ও ইসলামী ব্যাংক প্রধান সরবরাহকারী। ফলে, অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাজার থেকে ডলার কিনতে এসব ব্যাংকের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর বেশি প্রয়োজন হলে সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আবেদন করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংককে নির্দেশনা দিয়েছিল যে নির্বিচারে বাজারে যেন ডলার না ছাড়ে। যেহেতু বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিময় হার ব্যবস্থা এখন বাজারভিত্তিক (ফ্লোটিং) সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বা অন্যকোনো বৈদেশিক মুদ্রার দর নির্ধারণ করে না, পুরোটাই বাজারের চাহিদা-যোগানের ওঠা-নামার ওপর নির্ভর করে। অবশ্য প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোসহ অন্যান্য প্রধান ব্যাংকগুলোকে ডলার বিক্রির সময় যেন আবার বেশি দর না হাঁকে, সে বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ডলারের দর বাড়তে থাকে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারেও ডলার এখন শক্তিশালী। সে কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতন বা অবমূল্যায়ন এখন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ ব্যাংক কী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে চাইলেই ডলার দিতে বাধ্য? উত্তর হলো, অবশ্যই না। এলসি দেনা পরিশোধ করতে না পারার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছে যেসব ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপনা দুর্বল, নিজেদের সামর্থ্য না বুঝে এলসি খুলেছে, তারাই সংকটে পড়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকারও কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই মতামতকে সমর্থন করেছেন। তাছাড়া বাজারের চাহিদা-যোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না এগুতে পারলে সংকটতো হবেই। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক যে ডলার দেয়নি তাও সঠিক নয়। শুধু জুন মাসের শেষ সপ্তাহেই বাজারে সাড়ে তিন কোটি ডলার ছেড়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাজারে ডলারের দর বাড়ায় অবশ্য রপ্তানিকারক ও রেমিট্যান্সভোগীরা এখন লাভবান হবেন। বিপরীতে স্বাভাবিকভাবেই আমদানিকারকরা খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ, পণ্য আমদানির ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। তবে এটাই অর্থনীতির নিয়ম। আর আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তাই বিশ্বব্যাপী ডলারের দর বাড়া-কমার প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে বাধ্য।

অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হলো আইএমএফ-এর সঙ্গে শর্তানুসারে রিজার্ভ কমপক্ষে ৩০০ কোটি ডলার ধরে রাখা। বিষয়টি সত্যি। পিআরজিএফ চুক্তির আওতায় ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রিজার্ভ অন্তত ২৯০ কোটি ডলার ধরে রাখার নির্দেশনা ছিল। নতুন অর্থবছরে এটি বাড়িয়ে ৩০০ কোটি ডলারের ওপরে ধরে রাখতে হবে। ফলে, বাংলাদেশ ব্যাংক চাইলেও চট করে রিজার্ভ থেকে বাজারে ডলার ছাড়তে পারবে না।

তাহলে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার যৌক্তিকতা কতটুকু? এখানে দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো রাজস্ব দিক, অন্যটি হলো আর্থিক দিক। আমদানি বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো বিগত অর্থবছরে আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ হার এক লাফে ২৫%-এ নামিয়ে আনা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ)-এর পরামর্শে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এই কর্মটি করেছেন। এর ফলে, আমদানি অনেক সহজলভ্য হয়ে গেছে যার প্রতিফলন ঘটে আমদানি ঋণপত্র খোলার প্রবণতায়। বাণিজ্য উদারীকরণের ধারাবাহিকতায় এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা করছে তা কার্যত সরকারের রাজস্ব ও মুদ্রা নীতির বৈপরীত্যই তুলে ধরে। সরকারকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, তুলনামূলকভাবে অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।